স্মৃতি-বিস্মৃতি

বিমান ঘোষ রায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

মর্নিং ওয়ক—ইন মামাস ওয়ে □ ৯
দ্যাশের মানুষ □ ১৪
ফক্রুর গাড়িতে উয়িন্ড্সর ক্যাস্ল্ □ ১৮
দুদুমিঞার দুর্ভাবনা □ ২৩
ল্যান্ডো-বেঙ্গলিজ □ ২৯
ইমিগ্রেশন আইনের বেড়া ডিঙিয়ে □ ৩৬
সাংবাদিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ □ ৪২
চা-য়ের কাপে ঝড় □ ৫৩
হিন্দি-পাকি ভাই ভাই □ ৬১
মামার অতুল কীর্ত্তি □ ৬৮
শেষ অধ্যায় □ ৭৩

মর্নিং ওয়ক—ইন মামাস ওয়ে

প্যারিস থেকে হঠাৎ মাণিক্য মামার চিঠি পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি। সংক্ষিপ্ত চিঠি। লিখেছেন যে উনি লন্ডনে নামছেন ১৪ নভেম্বর। আমি যেন অবশ্যই এয়ারপোর্টে থাকি। কোন ফ্লাইট, কত নম্বর ফ্লাইট, কোনো উল্লেখ নেই। প্লেন হীথ্‌রোতে নামবে না গ্যাটউইকে, কিচ্ছু লেখা নেই তাতে। টুলুদাকে ফোন করে যে সব জেনে নেব তারও কোনো উপায় নেই। ফোন নম্বর জানলে তো। মামার চিঠির শিরোভাগে 'শ্রীশ্রীহরি সহায়', এই দুটি শব্দের পরিবর্তে টুলুদার টেলিফোন নম্বরটা দেওয়া থাকলে বরং তা বিশেষ সহায়ক হত। তা যখন নেই কী আর তবে করা যায় এখন, এক বসে বসে নিজের আঙুল চোষা ছাড়া। সত্যি, মহা ফাঁপরে পড়া গেল। ফাঁপর বলে ফাঁপর! মামার কান্ড কারখানা অবশ্য এরকমই। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আপনভোলা খামখেয়ালী মানুষ। নিজের ইচ্ছেতেই চলেন। ইচ্ছে হল উনসত্তর বছর বয়সে কলকাতা থেকে উড়ে চলে এলেন প্যারিসে। ছোট ছেলে টুলু, তার বিদেশিনী বউ ও দুই নাতনিকে দেখতে। মাত্র কয়েক মাস আগেই দেখেছেন ওদের যদিও যখন টুলুদারা সবাই পাঁচ সপ্তাহের ছুটি কাটাতে প্রধানত মামালয়েই থেকে এল এই গ্রীষ্মের বন্ধে। তবুও ইচ্ছে চাগলে মামা এরকমটাই করেন। সবাই তা জানেও। এবং প্যারিসে পৌঁছেই যথারীতি

নিজের ইচ্ছেমতো চলতে গিয়ে এক বিষম বিপত্তিও বাধিয়েছিলেন তিনি সেখানে। টুলুদা ও পেপিতা খুবই বিপাকে পড়ে এজন্য। তবে সে কাহিনী এখন নয়।

রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, টুলুদারা কি মামার ভ্রমণসূচি আদৌ জানে না? তা কি হয় কখনো। সেক্ষেত্রে টুলুদা বা পেপিতার একটা টেলিফোন আসা কি উচিত ছিল না? এল অবশ্য তা। পরদিন সকালে টুলুদা ফোনে কথা বলার পর নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে হীথরোতে গেলাম মামাকে রিসীভ করতে। মামাকে দেখে আমি তাঁকে চিনতে ভুল করে বসি প্রথমটায়। করার কথাও। তবে মামা কিন্তু ইতিমধ্যে আনন্দে ও আবেগে জড়িয়ে ধরেছেন আমাকে। মামাকে চিনতে অসুবিধে হওয়ার কারণ তাঁর অধুনা পালিত এক মুখ দাড়ি। উনি শ্মশ্রুধারী হয়েছেন। ইচ্ছে হয়েছে, দাড়ি রাখছেন। তা দাড়ির বয়েসও হল আজ নাকি প্রায় দেড় বছর। বেশ ঋষি-ঋষি চেহারা হয়েছে তাঁর এখন। মামা বললেনও প্লেনে এক মাদাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, পার্ডন মি, আর য়ু মাহাঋষি মাহেশ ইয়োগী? ইউরোপ আমেরিকায় তখন মহেশ যোগীর দারুণ রমরমা বাজার। হয়তো এই কারণেই মেমসাহেবটির ইয়োগী সান্নিধ্যে আসার জন্য এই আকুতি। মামা মাথা নেড়ে বলেছিলেন, না। তবে মনে মনে নাকি বলেছিলেন, ইচ্ছা করলে আমিও হইতে পারতাম। টাকা-টুকা করতাম। দেশ বিদেশ ঘুরতাম। কিন্তু ভণ্ডামি করতে ইচ্ছা করে না। এস্থলে অবশ্যই উল্লেখ্য, মামা কলকাতায় আছেন যদিচ বহু বছর, তাঁর যৌবনকাল থেকেই বলা যায়, কিন্তু আজও উনি কথা বলেন বিশুদ্ধ ঢাকাইয়া উচ্চারণে।

হীথরো এয়ারপোর্ট থেকে রাসেল স্কোয়্যারে নিজের ডেরায় পৌঁছুতে পৌঁছুতেই দুপুর গড়াল প্রায়। নভেম্বরের লন্ডন, দুপুর পার হলেই এখানে সন্ধে। অন্ধকার, কুয়াশা, ঠাণ্ডা, ঝির-ঝির বৃষ্টি, সব মিলিয়ে খুবই নৈরাশ্যব্যঞ্জক এ সময়টা। বিশেষ করে যাঁরা বেডসীটিং করেন তাঁদেরকে ভাগ্নোদ্যম করে দেয় ব্লাডি হরিব্‌ল এই আবহাওয়া। বেডসীটিং মানে একখানা কামরায় থাকা খাওয়া শোওয়া বসা সব। সংক্ষেপে ব্যাচেলরদের গুহা। তবে মামা নভেম্বরের আবহাওয়ায় দমেন না কিন্তু একটুও। উনি বিছানার ওপর বাবু হয়ে বসে পরের দিন থেকে মর্নিং ওয়কে যাবার প্ল্যান কষেন। আমি মনে মনে প্রমাদ গুণি। মামাকে বোঝাই, লন্ডনের এই ওয়েদারে মর্নিং ওয়ক এক অসম্ভব প্রস্তাব। কেউ-ই মর্নিং ওয়কের জন্য বের হন না এখানে।

—থোও ফালাইয়া তোমার ওয়েদার। হ, অরসেয় টুলুর ওইখানে থাকতে রোজই তো মর্নিং ওয়াকে গেছি। লগে লগে সুপ্তিও গেছে একদিন। মামা জেদ ধরেন।

—হ্যাঁ, তবে অরসে ছোট্ট একরত্তি এক শহর। গ্রামই বলা যায়। লোকে চাকরি থেকে রিটায়ার করে সাধারণত ওসব জায়গায় থাকে আর প্রাণ খুলে মর্নিং ওয়ক করে। কিন্তু লন্ডন বিশাল নগরী। ভারি ব্যস্ত শহর। এখানে মর্নিং ওয়কের সময় কোথায় মানুষের।

—সময় নাই, সময় কইরা নিতে হইবো। মর্নিং ওআকে মন প্রফুল্ল থাকে। ক্ষুধা হয়। শরীর ভালো থাকে। ইংরাজরা শরীরের যত্ন নেয় তাই দেখ না অগো স্বাস্থ্য। তুমিও আমার লগে লগে মর্নিং ওআকে বাইরাইবা। মামা আজ্ঞা দেন।

—কিন্তু পুলিশে ধরলে? জান তো লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ টহল দেয়। অন্ধকার রাতে মর্নিং ওয়কে বের হয়ে পুলিশের খপ্পরে পড়ি আরি কি। আর জান তো নভেম্বরে সকাল আটটার আগে এখানে দিনের আলোই ফোটে না। ভাব তবে একবার, মানুষ মর্নিং ওয়ক-ই বা করবে কখন আর কাজে কম্মেই যা যাবে কখন। না-না মামা, তুমি মর্নিং ওয়ক-টোয়কের চিন্তা ছাড়।

—মর্নিং ওয়াক করলে শুধাশুধি পুলিশ ধরবো ক্যান। এ কি মগের মুল্লুক না কি? মর্নিং ওয়াকারদের হাতে সিধকাঠি দ্যাখলে না হয় কথা ছিল। মামার পরিষ্কার যুক্তি।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। তবে পুলিশ শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নিরীহ মর্নিং ওয়কারদের ইদানীং এমন ধর-পাকড় শুরু করেছে যে লোকে বিরক্ত হয়ে মর্নিং ওয়ক করাই ছেড়ে দিয়েছে আজকাল। তা নয়তো প্রাতঃভ্রমণ করার ইচ্ছে তো আমার নিজেরও। বড় ভালো এ অভ্যেস। ভোরবেলায় উঠে হাঁটতে কি ভালো যে লাগে। মামাকে নিরস্ত করতে আমি এবার অন্য লাইন ধরি।

হ্যাঁ, মামাকে চিন্তাগ্রস্ত মনে হয় যেন এবার। ওষুধ ধরেছে তবে। কিন্তু আমার সব কথাই যে মাতুল চোখ বুঁজে বিশ্বাস করছেন তা-ও আবার মনে হচ্ছে না তাঁর ভ্রুকুটি দেখে। যন্ত্রণা আর কাকে বলে! বিষয়টিকে জোরদার করতে অতঃপর বলি কত কত ইংরেজরা পর্যন্ত ছেড়ে দিল তাদের দীর্ঘদিনের এ অভ্যেস, আমি তো কোন ছার।

ইতিমধ্যে টমাসদা রান্নার পর্ব শেষ করে ফেলেছে। টমাসদা, অর্থাৎ অগ্রজ প্রতিম টমাস বাঁড়ুজ্জ্যে। নিজে থেকে মামার জন্য একটি বিশেষ পদ রাঁধবেন বলেই এসেছিলেন। সেই বেলসাইজ পার্ক থেকে আজ সকালে। পরে অবশ্য একে একে সব রান্নাই তিনি করেন। মামা নিরামিষাশী হয়েছেন। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় হয়েছেন। আর কে না জানে নিরামিষ রান্নার তরিবতি ও পাকপ্রণালী এক কঠিন ব্যাপার। তবে সুখের বিষয়, সেই প্রণালী টমাসদার আয়ত্বাধীন। আজ শুধু মামা নয়, উপস্থিত সবাই টমাসদার হাতের নিরামিষ রান্নাই খাবে। ফুরফুরে বাসমতি চালের ভাত, চমৎকার সোনামুগের ডাল, ফুলকপির তরকারি, বাঁধাকপির ঘন্ট। শেষ পাতে দই। এদেশীয় দই। সুদৃশ্য কার্টনে পাওয়া যায়। চমৎকার লাগে খেতে। মামা তৃপ্তি করে খান।

খেয়ে দেয়ে উঠে মামা ছক কষতে বসেন। লন্ডনের কোথায় কোথায় ঘুরবেন, কী কী দেখবেন তার প্ল্যান। এই বয়সেও তাঁর ঘোরার উৎসাহ আর কর্মশক্তি দেখে সত্যি অবাক হতে হয়। ছক কষতে কষতে একসময় তড়াক করে দাঁড়িয়ে হুট করে ওভারকোট, টুপি, মাফলার চাপান মামা গায়ে। তারপর দস্তানা পরতে পরতে বলেন,

চল, ডাউনিং স্ট্রিট, ওয়েস্টমিনিস্টার, ট্রাফালগার স্কোয়ার ঘুইরা আসি। মামা এইরকমই। বাই চাপলে রোখা দায় তাঁকে। ঘর থেকে বের হবার মুখে আবিষ্কৃত হল মামা পেপিতার দেওয়া নতুন দামি ছাতাটা প্লেনে ফেলে এসেছেন। তবে ছাতা হারিয়ে মামার মুখে শোক-তাপ কিছু লক্ষ করা গেল না তেমন। গেছে তো গেছে। অহেতুক আর হা-হুতাশ কেন তার জন্য। মামা এইরকমই। এমনটাই তাঁর আচরণ।

ঘুরে টুরে এসে খেয়ে দেয়ে গল্প গুজব করে শুতে শুতে রাত হয় অনেক। ঘুমোবার আগে মামা আবার তাঁর নিজস্ব সুরে রতি সুখসারে গতমভিসারে নামক একখানি কৃষ্ণলীলার গান গাইলেন। এবম্বিধাদির পর শুয়েছি। এবং শুতেই ঘুম। মেঝেতে ম্যাট্রিস পেতে কম্বলের তলায় আরাম করে ঘুমুচ্ছি। দিব্যি জমাট ঘুম, এমনসময় খুচ-মুচ আওয়াজ। ঘুম চোখে দেখলাম, মামা উঠেছেন। ভোর রাত্তির, কত, তা পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা হবে তখন। মামা সুইচ টিপে খুট করে আলো জ্বেলে ফেললেন। মর্নিং ওয়কে যাবেন এখন মামা। উফ, মাঝ নভেম্বরের লন্ডন। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা মানে রীতিমতো গভীর নিশুতি রাত তখন। মাঝ রাতের মতোই মনে হবে। মামা সোয়েটার, হ্যাট, কোট ইত্যাদি যাবতীয় শীত বস্ত্র গায়ে দিয়ে ভারী জুতো পায়ে মচ-মচ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলেন। ইচ্ছে ছিল আমাকেও সঙ্গে নেবেন। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত আর ডাকেননি আমাকে। ভগবানের অসীম দয়া।

মামা বেরিয়ে যাবার পর পাঁচ-সাত মিনিটও হয়তো হয়নি। সবে জাঁকিয়ে ঘুমের রেশ আসতে শুরু করেছে আবার। এমন সময় হঠাৎ তীব্র শব্দে ডোর বেল বেজে ওঠে। ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে বিরক্ত মুখে নীচে নেমে মেন দরজা খুলতেই চমকে উঠি। সামনে দাঁড়িয়ে আর কেউ নয়, স্বয়ং মাণিক্য মামা। এবং মামার পাশেই দীর্ঘদেহী এক লন্ডন ববি। অসময়ে ঘুম থেকে তোলার জন্য প্রচুর খেদ প্রকাশ করে তারপর পুলিশ মহোদয় সবিনয়ে জিজ্ঞেস ক[illegible]ন, আপনি কি এই ভদ্রলোককে চেনেন? কে হন এই ভদ্রলোক আপনার? উনি কেন এই অন্ধকার রাতে রাস্তায় হাঁটছিলেন? একের পর এক সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে, আই মাস্ট বেগ ইওর পার্ডন স্যার বলে দৃশ্যত দুঃখিত পুলিসম্যান বিদায় নেন। যাবার আগে অনেকটা যেন [illegible]ষ স্খালনের জন্যই বলেন, আমি ভেবেছিলাম আপনার আংকল্ দিগভ্রান্ত হয়েছেন। সরি এনিওয়ে।

পুলিশ চলে যেতেই আমি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াই, 'কি বলেছিলাম না', ভঙ্গিতে, বলি, কী, হল তো এবার? নিরীহ মর্নিং ওয়কারদের কীরকম হয়রান হতে হয় পুলিশের হাতে, হাতে নাতেই তার প্রমাণ পেলে এবার। তবুও তো এই পুলিশটা অনেক ভদ্র। মামা অপরাধী অপরাধী মুখ করে জিজ্ঞেস করেন, তবে কি এই দ্যাশে আর মর্নিং ওয়াক করে না কেউ?

—হ্যাঁ করে। বাড়ির পেছনের বাগানে করে।

—আর যাগো বাগান নাই?

—তারা ঘরের মধ্যেই সেরে নেয় এ কাজটা। কি আর করবে।

—আমারেও কি তবে এই ঘরের মধ্যেই মর্নিং ওয়াক করতে হইবো?

—তাছাড়া আর উপায় কি।

মামা তারপর দিন থেকে ভোর রাতে উঠে ঘরের মধ্যেই নিয়মিত হাঁটতেন। প্রতিদিন ভোর রাতে। যে ক'দিন ছিলেন। আমি মেঝেতে ম্যাট্রিসের ওপর শুয়ে ঘুমোতাম। উনি আমাকে প্রদক্ষিণ করে হাজার দুই আড়াইবার চক্কর কাটতেন। একনাগাড়ে। দুজনেরই তাতে প্রাণান্তকর অবস্থা হত। চক্কর কাটতে কাটতে মামার শির চক্কর খেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মর্নিং ওয়ক থেকে বিরত হননি একদিনের জন্যও। আর মর্নিং ওয়কের ঠ্যালায় আমার ভোরের দামি ঘুমের বারোটা বাজত প্রতিদিন। হ্যাঁ, প্রতিদিনই।